মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

বিজ্ঞান গবেষণায় কমপিউটার

মানবসভ্যতার বিকাশের ধারায় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষন করলে একথা আজ আর কারো মানতে অসুবিধা হয় না যে, মানুষের মনের গহন কোণে প্রস্ফুটিত হওয়া নিত্য নতুন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কল্পনাই সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে এনেছে বৈপ্লবিক মোড়। এই যে উদ্ভট কল্পনা এর শেষ কোথায়? মানুষ জানে না। জানে কেবলই কল্পনা করতে। জানে কেবলি নতুন নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিতে। মুশকিলটা হচ্ছে এই, বিজ্ঞান দিনে দিনে এতই জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে নিজস্ব ভাষার পরিভাষার কুহেলীকায় যে এর মৌলিক প্রত্যয়গুলো এখন দুচারজন হাতে গোনা বিজ্ঞানী ছাড়া আর কারো কাছেই যেন বোধগম্য হতে চায় না। সভ্যতা এগোয় ঠিকই দ্রুত থেকে দ্রুততর কিন্তু, সাধারণ্যের বোধের সামনে কেবলি দাঁড়িয়ে যেতে থাকে একের পর এক দুরতিক্রম্য দেয়াল। বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে মহাজাগতিক স্ট্রিং তত্ত্বের কথাই ভাবুন। তত্ত্বটি বলছে-বস্তু হচ্ছে চুলের ন্যায় সুক্ষাতিসুক্ষ সরু শক্তির স্ট্রিং দিয়ে গঠিত। এক মিলিমিটারের এক কোটি কোটি কোটি (এক এর পর একুশটি শূন্য বসালে যতো হয় ততো) ভাগের একভাগ ব্যাসের এসব স্ট্রিং লম্বায় লক্ষকোটি আলোক বর্ষ। এবং আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এরা কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ ও সময়ের অতিচেনা চতুর্মাত্রিক জগতের থেকে ভিন্ন আরো উচ্চতর বহুমাত্রিক জগতের বাসিন্দা। অথচ এদের নিয়ত শিহরনই ক্রমাগত উগরে দিচ্ছে অগণিত পরমাণু কণা যা আমাদের এই পরিচিত বিশ্বকে সংগঠিত করছে অপরূপ অবয়বে। এই যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এতো বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকেও হার মানিয়ে দেয়। এমন যে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা বিমুক্ত উদ্ভট বৈজ্ঞানিক সত্য এ কিন্তু ঐ গাণিতিক পদার্থবিদ্যা তথা গণিতেরই অনিবার্য সিদ্ধান্ত যে গণিত আমাদের শিখিয়েছে দুয়ে দুয়ে চার হয়। গণিতের সোপানে পা রেখে আমরা পৌছে যাই কল্পজগতে। মানুষেরও সীমাবদ্ধতা আছে। এক সময় কল্পনার গতিও মন্থর হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই আবার দায়িত্ব নেয় মানুষেরই তৈরী কমপিউটার। দুর্বোধ্য জটিল গাণিতিক ফলাফলকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অবশেষে চমৎকারভাবে অনুরূপায়ন তথা সিমুলেশন প্রক্রিয়ায় সজীব চিত্ররূপে ফুটিয়ে তোলে পর্দায়।

বস্তুত সাড়ে তিনশ বছর আগে নিউটনের হাতে গোড়াপত্তন হওয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতিতে ব্যাপক মৌল পরিবর্তন সাধন করেছে কমপিউটার তথা ডিজিটাল বিজ্ঞান। আমাদের সময়ের এ এক অনবদ্য প্রযুক্তি। এ ডিজিটাল বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব দুর্দমনীয় গতিশীলতা ও কর্মকুশলতায় বিমুগ্ধ বিজ্ঞানীরা এমন মন্তব্যের আস্ফালনেও দ্বিধা করছেন না যে, তাদের মতে, এমন সময় একদিন আসবে যেদিন তৈজসপত্রের মতোই আপনার রান্নাঘরে একটি সুপার কমপিউটার আসন গেড়ে বসবে। ধরুন, তখোন আপনার একটি ঔষধ কিংবা একটি বস্তুর প্রয়োজন হয়ে পড়লো যেটির অস্তিত্ব আগে কখনো ছিলো না। ঐ সুপার কমপিউটারটিকে নির্দেশ দিলে সে হয়তো তখোন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের সমন্বয়ে আপনার ঈপ্সিত গুনাবলীর জিনিসটি সংশ্লেষিত করা যায় কিনা, গেলে কীভাবে তাই পর্দায় আঁকজোক কষে দেখিয়ে দিলো। ডিজিটাল বিজ্ঞান তাই এই বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তিমত্তার দাপটে এখন সমস্ত বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যমনি হয়ে বসে আছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আগেকার গনকযন্ত্রগুলোর মতো প্রকৃতি জগতের আইন কানুন বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলো কেবল মাত্র সংখ্যা ও অক্ষরের ভাষায় না দিয়ে একালের কমপিউটারগুলো হাজির করছে অভূতপূর্ব দৃশ্যগ্রাহ্য সজীব অনুরূপায়িত বা সিমুলেটেড চিত্রের সমাবেশ। এসব চিত্ররূপ প্রায়ই পরীক্ষা নীরিক্ষায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীকে প্রদান করে বহুবিবর্ধিত অপরোক্ষানুভূতি বা স্বজ্ঞা (Intuition) ফলে কখনো কখনো একজন সাধারন মানের বিজ্ঞানীও হয়ে উঠেন অসাধারন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের জনক।

এ ডিজিটাল বিজ্ঞানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিস্ময়কর অবদান হলো এটি ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এমন সব নিত্য নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে চলেছে যাদের নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানো পৃথিবীতে স্থাপিত বাস্তব কোনো ল্যাবরেটরীর গন্ডীতে মোটেই সম্ভব নয়। সময়ের ভাঁজের কথাই ধরা যাক, একজন জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী চাইলে মিনিটের মধ্যেই কমপিউটারের পর্দায় এক গাদা মহাজাগতিক ধূলিকন্যা থেকে একটি নক্ষত্র সৃষ্টি করে তাকে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর প্রজ্বলন্ত রেখে অবশেষে সুপারনোভায় বিস্ফোরিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখতে পারেন। আবার উল্টোটাও সম্ভব। স্ক্রীপস ইন. অব ওসেনোগ্রাফ্রির গবেষক চার্লস ক্রকস সহজেই চোখের এক পলককে টেনে প্রলম্বিত করে প্রত্যক্ষ করতে পারেন গোটা একটা কর্ম দিবস হিসেবে। আমাদের শরীরে অত্যন্ত দ্রুততায়-এক সেকেন্ডের প্রায় একশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে সংঘটিত প্রোটিনের রহস্যময় কর্মকান্ডকে দেখবার জন্যে ক্রকস ওই সময়টুকুতেই সাড়ে সাত লক্ষ ছবি তোলেন এবং তাকে সাত ঘন্টার ভিডিওতে প্রদর্শন করেন। এ হলো সময়ের কোমল ভাঁজগুলোকে প্রযুক্তির আলতো পরশে মেলে ধরে প্রকৃতি রাজ্যের রহস্য প্রত্যক্ষ করার এক কাহিনী। আবার প্রায় দুশ কিলোমিটার দূরে আমেরিকার পিটসবার্গ স্ক্রে ৯০ সুপার কমপিউটারের ভেতরে গাণিতিক পেশীতে ডিজিটাল রক্তসঞ্চালনকারী স্পন্দনশীল একটি মানব হৃদপিন্ডের ত্রিমাত্রিক মডেল ভেসে উঠছে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটারের পর্দায় চিকিৎসা গবেষক চার্লস এস পেসকিন ও ডেভিড ম্যাককুইনের সামনে। হৃদপিন্ডের এ মডেলটির উদ্ভাবক উল্লেখিত দুই বিজ্ঞানীর মতে, মডেলটি কার্ডিওভাসকুলার রোগের চিকিৎসা বিষয়ে এমন সব তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে যা এর আগে কোনোভাবেই পাওয়া যেতো না।

ওদিকে চ্যাপলহিলের নর্থক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন প্রান রসায়নবিদ একটি শক্তিশালী ক্যান্সার নিরাময়কারী ঔষধের অণুকে প্রোটিনের তথাকথিত রিসেপ্টর অবস্থানে বসিয়ে মোচড় দিয়ে দিয়ে বন্ধনবল ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষন করে ঔষধটির কার্যকারীতা বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করেন। একই কায়দায় গত গ্রীষ্মে অষ্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগন ফ্লুভাইরাসকে চিরতরে অকার্যকর করে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন 'ডিজাইনার' অণু উদ্ভাবন করেছেন।

কমপিউটারের সহায়তায় ডিজাইন করার জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ক্যাডএর ব্যবহার প্রকৌশলীদের একটি সাধারন ব্যাপারে পরিনত হয়েছে। সম্প্রতি এটিএন্ডটি বেল ল্যাবের বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের জন্য অতীব ক্ষমতাধর মাইক্রোচিপ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় খুঁজে পেয়েছেন এমন এক প্রোগ্রাম যাকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করে সিলিকন স্ফটিকের পরমাণু সমুদ্রে দক্ষ ডুবুরীর মতো নিমজ্জিত হয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারেন সাঁইসাঁই করে ছুটে চলা ইলেকট্রন ঝাঁকের গতিবিধি। নিরীক্ষন করতে পারেন বর্তনীর যাবতীয় কর্মকান্ড। আরো দক্ষ ইঞ্জিন নির্মান প্রক্রিয়ায় ডেট্রয়েটের গবেষকগন কমপিউটারের হাত ধরে প্রবেশ করেন অন্তর্দাহী ইঞ্জিনের দহন প্রকোষ্ঠে প্রত্যক্ষ করেন দহনের আগে কোন কৌশলে গ্যাসোলিন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফোঁটায় বিস্ফুরিত হয়। বিয়ারের হালকা থেকে হালকাতর কৌটা ডিজাইন থেকে শুরু করে আরো বেশী শোষনক্ষমতাসম্পন্ন সিন্ক বানানো এমনকি অধিকতর দক্ষ মাটির সরানোয় পারঙ্গম ক্যাটারপিলারের নমুনা তৈরীর কাজটিও এখন কমপিউটারের পর্দায় সম্পন্ন, হচ্ছে শত সহস্র ডলার সাশ্রয়ে।

আরেকটি ব্যাপারও বেশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে-গবেষণায় সবক্ষেত্রেই এখন যে সুপার কমপিউটার লাগবে এমন কোনো কথা নেই। কোথাও কোথাও নেটওয়ার্কে যুক্ত একটি ওয়ার্কস্টেশন কিংবা একটি ডেস্কটপই যথেষ্ট। পাওলো অলটো গবেষণা কেন্দ্রের এক বিজ্ঞানী ন্যানো প্রযুক্তিরাজ্যে ইটের পর ইট গেঁথে অট্টালিকা নির্মানের মতোই পরমাণুর ওপর পরমাণু সাজিয়ে আনবিক যন্ত্র বানানোয় ব্যস্ত। ভদ্রলোকের নাম রালফা মার্কল। কেবলমাত্র একটি ওয়ার্কস্টেশনেই তিনি অনায়াসে এসব কাজ করছেন।

বিজ্ঞান গবেষণায় কমপিউটার তথা ডিজিটাল বিজ্ঞানের এই যে সর্বব্যাপী বিচরণের নাটক প্রত্যক্ষ করছি এমনটা কিন্তু সবসময় ছিলো না। একটু পেছনে চোখ বুলিয়ে নিলে বোঝা যাবে কথাটির সত্যতা। অন্যান্য প্রযুক্তির মতোই ডিজিটাল প্রযুক্তিটিও পেন্টাগনের আনুকূল্যে সামরিক ধ্বংসাত্মক কৌশলের অংশ হিসেবেই তার প্রাথমিক পদযাত্রা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে ওয়াশিংটন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করলো কমপিউটার ও সফটওয়্যার উদ্ভাবনে, অব্যাহত গতিতে সমর্থন বাড়তে থাকলো গোপনবার্তা উদ্ধারকারী প্রোগ্রাম ও উচ্চপ্রাযুক্তিক সমরাস্ত্র ডিজাইনারদের প্রতি। ক্রমেই সুবিকৃতি লাভ করলো সুপার কমপিউটার, হাইস্পিড ডাটা কমিউনিকেশন ও নেটওয়ার্কিং। একালে শিল্পকারখানাগুলোয় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন বহু প্যাকেজেরই আতুঁড়ঘর মূলত ওই পেন্টাগন। এই আশির দশকের শেষ নাগাদও প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের প্রতি বাইরের বিজ্ঞানীরা অনেকটা ঈর্ষার সাথে তাকাতেন। কেননা বাইরের বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজে দূর্গতির সীমা ছিলো না। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এজন তত্ত্বীয় রসায়নবিদ মারটিন কারপ্লাসকে গবেষণার জন্যে রাতের অবসরে একটি হসপিটালের কমপিউটারকে ব্যবহার করতো হতো। আর ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ল্যারি স্মারকে একটি ক্রে সুপার কমপিউটারে কাজ করতে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ছুটে আসতে হতো জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটে। এ ছিলো পরিস্থিতি। যা হোক, সবকিছু ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে যখোন ১৯৮৫তে অ্যামেরিকায় ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন এনএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশব্যাপী ডাটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে,

চারটি সুপার কমপিউটার কেন্দ্র বসিয়ে দেশের তিনডজন বিশ্ববিদ্যালয়কে একই নেটওয়ার্কে স্থাপনের জন্য দু'মিলিয়ন ডলার অর্থের বরাদ্দ হলো। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে গোটা পরিস্থিতিতে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এসময়গুলোতে ব্যয়ের পরিমাণ বিলিয়ন ডলারের ঘরে পৌঁছে যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগের এক মহোৎসব জমে ওঠে। কমপিউটারগুলোর অকল্পনীয় গতি ও কর্মক্ষমতা আরোপনের চেষ্টা চলতে থাকে। বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এ প্রযুক্তিটির সুবিপুল বিন্যাস প্রক্রিয়ায় সামরিক স্থাপনা ছেড়ে প্রযুক্তি শান্তির দূত হিসেবে জনগনের মাঝে এসে জন্ম দিতে থাকে নিত্য নতুন অত্যাধুনিক প্রায়োগিক কমপিউটারচালিত যন্ত্রের, অভিধানে সংযুক্ত হতে থাকে অসংখ্য শব্দ, ভাষা-পরিভাষা। এ ধারাবাহিকতারই এক নয়া গনকযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে ১৯৯৬ সালে। নাম টেরাঅপস।

প্রযুক্তির আগামী বছরের রঙ্গমঞ্চে নটরাজের ভূমিকায় অবতরণের অপেক্ষায় অমিতশক্তিধর দূর্দান্ত গতির সুপার কমপিউটারের টেরাঅপস নামটি এসেছে ট্রিলিয়ন এবং অপারেশন শব্দ দুটো থেকে। অভূতপূর্ব গতির এই কমপিউটারটি এক সেকেন্ডে এক ট্রিলিয়ন অর্থাৎ এক লক্ষ কোটি জটিল গাণিতিক সমীকরনকে দুমড়ে মুচড়ে দেবে। এটি হবে একালের সবচেয়ে ক্ষমতাধর গনিতচর্বণকারী সুপারকমপিউটারটির তুলনায় দশ থেকে পঞ্চাশগুন বেশী ক্ষমতাবান। আর এই দূর্দমনীয় গতিই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে আজকের বিজ্ঞানীদের সামনে দূর্গম হিমাদ্রিরূপে দন্ডায়মান তথাকথিত তিরিশটি গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জে মোকাবেলায়। বিজ্ঞানীরা এটি ব্যবহারে হয়তো জানতে পারবেন কেমন করে হাইড্রোজেন জ্বালানী ব্যবহারকারী ফিউশনচুল্লী বানানো যায়। পৃথিবীর আবহমন্ডলের গতিবিধির প্রকৃত রূপরেখা থেকে সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস হয়তো বিজ্ঞানীরা দিতে পারবেন, জানতে পারবেন প্রাণের মৌলউপাদানই বা কি কিংবা বের করতে পারবেন প্রাণের মডেল অনুরূপায়নের একটি সফটওয়্যার। জ্বালানী দহন প্রক্রিয়ার রহস্য, পদার্থের মৌলিক কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন গঠনকারী কোয়ার্ক এর অস্তিত্ব ও আচরন ব্যাখ্যাকারী বিজ্ঞান কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্সের বহু অজানা প্রশ্নের সমাধানে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে ওই টেরাঅপস মেশিনটি। ম্যাসিভলি প্যারালেল প্রসেসিং পদ্ধতিতে এক একটি টেরাঅপস সুপার কমপিউটারে ব্যবহৃত হবে কয়েক ডজন থেকে কয়েক হাজার মাইক্রোপ্রসেসর। আর এসব মাইক্রোপ্রসেসরের প্রতিটির ন্যূনতম গতিই থাকবে একালের একটি ক্রে সুপার কমপিউটারের সমান। প্রতিটির প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দাম পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় ধারনা করা হচ্ছে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ হয়তো হাতে গোনা দুচারটা মেশিন স্থাপিত হবে পৃথিবীতে। তাই বলে দূর্ভাবনার কিছু নেই। সমস্যার গুরুত্বানুযায়ী যে কোনো বিজ্ঞানীই এদের ব্যবহারের সুযোগ পাবেন তা যেখানেই স্থাপিত হোক মেশিনগুলো। কেননা ইতোমধ্যেই ইন্টারনেটে এদেরসাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সবার জন্যেই অবারিত করতে এনএসএফ তথা সংশ্লিষ্ট মহল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছে।

মজার কথা হচ্ছে, এই অমিত শক্তিধর কমপিউটার বানানোর প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমান ডাটা আদানপ্রদানের প্রয়োজনে সুপরিসর ডাটা পাইপলাইন তৈরী করতে যেয়ে টেলিকমিউনিকেশনেও এসে গেলো আরেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দূর্দান্ত গতিশীলতায় প্রতি সেকেন্ডে ছুটে চলা বিলিয়ন বিলিয়ন বিট তথ্যকে টেরাঅপস মেশিনে এদিক ওদিক পারাপার করতে প্রয়োজন সুপ্রশস্ত ডাটাপাইপ লাইন-গিগাবিট লিংক। একালের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ডাটাপাইপ লাইন দিয়ে কেবলমাত্র পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন বিট সেকেন্ডে পার হতে পারে। অবশ্য এমসিআই কমিউনিকেশনস কর্পো. নামের একটি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে আড়াই গিগাবিট ডাটা হস্তান্তরে সক্ষম নেটওয়ার্ক উপহার দিতে শুরু করেছে। আর এই ডাটা পাইপ লাইনই গোটা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাকে এক সেকেন্ডে পার করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

শুধু তাই নয়। এই যে গিগাবিট হস্তান্তরে ক্ষমতাবান নেটওয়ার্কের আবির্ভাব বিজ্ঞান গবেষণায় কমপিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগের এ আবার আরেক বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছে। গিগাবিট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা, ইন্টারনেট তথা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এসবই বিশ্বজুড়ে খোলামেলা ভিন্নরূপের ভার্চুয়াল ল্যাবেরটরী নামের একটি পরীক্ষাগারের স্বপ্নকে দিয়েছে বাস্তব ভিত্তি। একটি জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে অন-লাইনে বিজ্ঞান গবেষণায়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ্য বিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটিয়ে দিচ্ছে এই গিগাবিট প্রযুক্তি। পৃথিবীর তিন প্রান্তে অবস্থানরত তিনভিন্ন বিষয়ের- জীববিজ্ঞান, রসায়ন, প্রানপদার্থ বিজ্ঞনের- তিন শ্রেষ্ঠ্য বিজ্ঞানী ইচ্ছা করলে একটি জটিল ভিজিটাল পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রত্যক্ষণ ও মতামত আদান প্রদান একই মুহূর্তে যুগপৎ যে যার জায়গায় বসেই সম্পন্ন করতে পারেন। দেশদেশান্তরের সীমানামুছে গোটা বিশ্বটাই আজ একটি একক ভার্চুয়াল গবেষণাগারে পরিণত হতে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম বহু বিজ্ঞানীই কমপিউটার তথা গাণিতিক মডেলের উপর নির্ভরশীল হতে একটু আধটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। এতো ঠিকই যে মনুষ্যনির্মিত এই যন্ত্রটির কাজকর্মে যাই হোক সীমাবদ্ধতা কিছু আছেই এবং ফলাফল পাওয়া যায় কতক জিনিসপত্র ছাড় দিয়ে আপাত বা সন্নিকর্ষিত দশায়। কেননা বিজ্ঞানী যদি সত্যিসত্যিই প্রকৃতিরাজ্যের মৌলিকবল কিংবা কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স কিংবা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে মডেল উপস্থাপন করতে চান তাহলে একালের সবচেয়ে ক্ষমতাধর কমপিউটারটিও খুব বেশী হলে দশ বারোটি পরমাণু নিয়ে কাজ করতে পারবে এর বেশী হলেই ঘটে বিপত্তি, একালের সুপার কমপিউটারটিও বোকা শিশু বনে যায় তৎক্ষনাৎ।

সেজন্যই বিজ্ঞানীরা আর চুলচেরা বিচারে উত্তীর্ণ অতি নিখুত বর্ণনার ধারে কাছে না ঘেঁষে বরং কতক চাতুর্যপূর্ণ ভবে অর্থবহ সহজ সরল পন্থাকে বেছে নেন। বস্তুত তখোন প্রায় গোটা ব্যাপারটাই হয়ে পড়ে নান্দনিক সৌকর্যে ভরপুর কাব্যময়। উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। সৌরজগৎ বিষয়ক কোনো গবেষণা হচ্ছে। এখানে এক একটি গ্রহকে লক্ষকোটি পরমাণু দিয়ে গঠিত জটিল সংগঠন বিবেচনা না করে পর্যায় একটিগ্রহকে কেবলমাত্র একটি একক বস্তু রূপে জ্ঞান করা হয়। ভুলে যেতে হয় গ্রহের অভ্যন্তরে নিজস্ব পরিমন্ডলে সংঘটিত ঘটনাগুলোকে। একইভাবে একটি গ্যালাক্সির অনুরূপায়নে সৌর জগৎ তথা একটি নক্ষত্রের নিজস্ব পরিবারকে কেবল একটি মাত্র বস্তু বিবেচনা করতে হয়। আর একজন আবহাওয়াবিদ আবহাওয়ায় মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব কমপিউটারে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বিপুলায়তন ডাটা বিশ্লেষণের ঝামেলা এড়াতে সূর্যালোক মেঘের ওপর থেকে কেমন করে প্রতিফলিত হয় এ নিয়ে মাথা ঘামান না। এভাবেই বিশেষ বিশেষ গবেষণার সাথে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট না হলে, প্রায় আন্তসম্পর্কহীন তথ্যাবলীর সমাবেশকে এড়িয়ে একটি মোটামোটি নির্ভূল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বিজ্ঞানীরা নানান কায়দায় ছাড় দেন।

কমপিউটারে গবেষণায় এই যে ছাড় দেয়া, এই যে বিষয়গুলোকে কতক সংকুচিত সীমানায় বিবেচনা করার ব্যাপার এ কিন্তু সব সময় সুখকর হয় না। বরং বিজ্ঞানীদের সামনে এ আজও মাথাব্যথার কারণ। কখনো কখনো এসব বৈজ্ঞানিক গবেষণার সন্নিকর্ষিত ফলাফলকে ভিত্তি করে যদি কোনো সরকার রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে অবতীর্ন হয় তখনই বিপত্তি ঘটে অমোচনীয়, হয়ে যায় রীতিমতো কেলেংকারী। পৃথিবীর আবহমন্ডলের ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটছে- এ সত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত। কিন্তু বাস্তবিকই কোন কৌশলে এ ব্যাপারটি ঘটছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিতে কিংবা এ অবস্থা থেকে মুক্তির কায়দা কী হবে সে বিষয়ে একমত হতে বিজ্ঞানীরা হিমশিম খাচ্ছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় যে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই ঝুঁকিপূর্ণ সরকারগুলোর জন্যে। আসলে, ঋসড়া মডেলের সমস্যাও হয়তো ভবিষ্যতে থাকবে না। কেননা, ডিজিটাল বিজ্ঞানের দিকে পৃথিবীর প্রখর মেধাবী তরুণরা ক্রমাগত ঝুঁকে পড়ছে, উদ্ভাবন করছে অনুরূপায়নের নিত্য নতুন কৌশল। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অন্যত্র। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের এবং তৎপরবর্তী কোয়ান্টাম ফলবিজ্ঞানের দুটি মহাবৈপ্লবিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের মতোই এ বিংশ শতাব্দীর শেষ সিকিতে আবির্ভূত হয়েছে আরেক নয়া বিজ্ঞান- কেওস তত্ত্ব (Choas theory) বা বিশৃংখলতার বিজ্ঞান। প্রকৃতি রাজ্যের জটিল বিশৃংখলতার (নাকি শৃংখলার?) রহস্যময়তার অভ্যন্তরে অন্তঃশীল ফল্গুধারার মতো ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে আরেক প্রাকৃতিক নৃত্যনাট্য স্ব-সংগঠন সেল্ফ অর্গানাইজেশন। এ যেন ভাঙ্গা গড়ার নিরন্তর ক্রীড়াকৌতুক। এতোকাল ধারনা ছিলো প্রাকৃতিক রহস্যময় আচারণ ব্যাখ্যা করতে হলে সংগঠনকারী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানগুলো আলাদা আলাদা চরিত্র জানলেই চলবে। কিন্তু না, সম্প্রতি বিজ্ঞানের এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতীয়মান করছে প্রকৃতিজগতের স্বসংগঠনের আচরণ। মনে হচ্ছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানগুলোর আলাদা আলাদা আচরণে এবং তাদের সংগঠিত দশায় সামগ্রিক আচরণে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। এ যেন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হয়ে যাবার ব্যাপার। প্রকৃতির এ স্ব-সংগঠনের ঘটনা ব্যাখ্যায় হয়তো টেরাঅপস মেশিনটিও মুখ থুবড়ে পড়বে। জগতের সামগ্রিক সংগঠন সৌন্দর্যের নান্দনিকতা উদ্ধারের কঠিন দায়িত্ব তখোন কে নেবে? আগামী শতাব্দীর গোড়ার দিকে আগমন অপেক্ষায় এক সেকেন্ডে দশ কোটি সমীকরণ বিধ্বংসী পেটাঅপস (Petaops) মেশিনটি নাকি কোয়ান্টাম কমপিউটার নাকি অন্য কেউ? ●

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

কমপিউটার জগৎ বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যায়-

নিউ মডেল লাইব্রেরী-বেইলী কমপ্লেক্স, উত্তরা; জ্ঞান কোষ-সোবহানবাগ মসজিদের নীচে; মোস্তফা বুক ষ্টল-কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড; মনা নিউজ কর্ণার-পিজি হাসপাতালের গীচে; অনুপম জ্ঞান ভান্ডার-ঢাকা টেডিয়াম (সোতলা); সাগর পাবলিশার্স-নিউ বেইলী রোড; সৃজনী-কমলাপুর রেল ষ্টেশন, ঢাকা।